

## পূর্ণাঙ্গ নামায

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, সালাত একটি আরবি শব্দ। আর নামায হচ্ছে ফারসি শব্দ। সালাত শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রার্থনা, অনুগ্রহ, পবিত্রতা বর্ণনা করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা অথবা নত হওয়া, অবনত করা ও বিস্তৃত করা। ইসলামী পরিভাষায় শরিয়তের নিয়ম মোতাবেক এক বিশেষ পদ্ধতিতে আল্লাহর গুনগান করা, রুকু সেজদা সহ আল্লাহর ইবাদাত করাকে সালাত বলা হয়।

ইসলামের মূল রোকন বা স্তম্ভ পাঁচটি। এর মধ্যে ঈমানের পরই সালাতের স্থান। এটি ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি ও শ্রেষ্ঠ ইবাদত। কোন ব্যক্তির ঈমান গ্রহণ ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর যে কাজটি সর্বপ্রথম বর্তায় তা হোল নামায। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সকল নবী রাসূলের যুগে তাদের উম্মতের উপর সালাত ফরয ছিল। কুরআনে পাকে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন জায়গায় সরাসরি ৮২ বার সালাত শব্দ উল্লেখ করে নামাযের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

প্রতিটি মুসলমানের উচিত সঠিক পদ্ধতিতে নামায আদায় করা। সঠিক পদ্ধতিতে নামায আদায় না করলে আল্লাহ নিকট আমাদের ইবাদত অপরিপূর্ণ থেকে যায়। সুতরাং একজন মুমিনের জীবনে সঠিক পদ্ধতিতে নামায আদায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সঠিক পদ্ধতিতে নামায আদায়ের গুরুত্ব উপলব্ধি থেকেই নামায আদায়ের সঠিক পদ্ধতি নিজে জানা এবং অপরকে জানানোর জন্যই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

সূচিপত্র		
বিষয়		পৃষ্ঠা নম্বর
১. নামাযের প্রাথমিক বিষয়াবলী		
১.১	নামায ফরয হওয়ার সর্ত	1
১.২	নামাযের ফরয সমূহ	1
১.৩	নামাযের ওয়াজিব সমূহ	2
১.৪	নামাযের সুন্নত সমূহ	3
১.৫	নামাযের মুস্তাহাব সমূহ	4
১.৬	নামায ভঙ্গের কারণ সমূহ	4
১.৭	নামাযের ওয়াক্ত ও রাকাত	5
১.৮	নামাযের নিষিদ্ধ সময় সমূহ	6
১.৯	নারী ও পুরুষের নামাযের পদ্ধতিতে পার্থক্য	6
২. নামায পড়ার নিয়ম		
২.১	নামাযে দাঁড়ানো	
২.২	নিয়াত	
২.৩	তাকবিরে তাহরিমা ও হাত বাঁধা	
২.৪	সানা	
২.৫	তাউজ ও তাসমিয়া	
২.৬	সূরা ফাতিহা ও কেরাত	
২.৭	রুকু	
২.৮	সেজদাহ ও দুই সেজদার মধ্যবর্তী বৈঠক	
২.৯	আরামের বৈঠক	
২.১০	শেষ বৈঠক	
২.১১	সালাম ফেরানো	
৩. সালাম ফেরানোর পূর্বের ও পরের আমল		
৩.১	সালাম ফেরানোর পূর্বের দোয়া	
৩.২	ফরয নামাযের পর প্রয়োজনীয় কিছু তাসবিহ	
৩.৩	মোনাজাত	
৩	নামাযের সময় কিছু সাধারণ ভুল	
৪	নামাযের ফজিলত	
৫	নামায না পড়ার শাস্তি	
৬	নামায পড়েও জাহান্নামে	
৭	সেজদা সাহু	

## ১.১ | নামায ফরয হওয়ার সর্ত

কারো উপর নামায ফরয হওয়ার জন্য শর্তগুলো হলো:-

- মুসলিম হওয়া
- সাবালক হওয়া
- সুস্থ মস্তিষ্কের (মানুষ) হওয়া।

## ১.২ | নামাযের ফরয সমূহ

নামাযের মোট ফরয ১৩টি। কোন ফরয ছুটে গেলে নামায হবে না। পুনরায় নামায আদায় করতে হবে।

✓ নামাযের বাহিরে ৭টি ফরয। যেগুলোকে নামাজের শর্ত বলা হয়।

1. শরীর পাক হওয়া। (সূরায়ে মায়িদা:৬)
2. কাপড় পাক হওয়া। (সূরায়ে মুদাসসির:৪)
3. নামাযের জায়গা পাক হওয়া। (বাকারা: ১২৫)
4. ছতর ঢাকা অর্থাৎ, পুরুষগণের নাভি হতে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত এবং মহিলাদের চেহারা, কজ্জি পর্যন্ত এবং পায়ের পাতা ব্যতিরেকে সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা।) (বাকারা-৩১)
5. কিবলামুখী হওয়া। (বাকারা-১৪৪)
6. ওয়াক্তমত নামায পড়া। (নিসা-১০৩)
7. অন্তরে নির্দিষ্ট নামাযের নিয়ত করা।(নিয়ত পড়তে হয়না। অন্তরের দৃঢ় সংকল্প ও ইচ্ছা করার নামই হল নিয়ত ) (বুখারী হা: নং ১)

✓ নামাযের ভিতরের ৬ টি ফরয। যেগুলোকে নামাজের রোকন বলা হয়।

1. তাকবীরে তাহরীমা বলে নামায শুরু করা অর্থাৎ, শুরুতে আল্লাহু আকবার বলা। (মুদাসসির: ৩)
2. কিয়াম করা অর্থাৎ, ফরয ও ওয়াজিব নামায দাঁড়িয়ে পড়া। (বাকারা-২৩৮)
3. কিরাত পড়া। (মুযযাম্মিল:২০)
4. রুকু করা। (হজ্ব-৭৭)
5. দুই সেজদা করা। (প্রাগুক্ত)
6. শেষ বৈঠক করা। (আবু দাউদ হা: নং ৯৭০)

## ১.৩। নামাযের ওয়াজিব সমূহ

নামাযের ওয়াজিব ১৪টি। ওয়াজিব ছুটে গেলে “সেজদা সাহু” দিতে হবে। না হলে নামায শুদ্ধ হবে না।

1. সূরায়ে ফাতিহা পূর্ণ পড়া। (বুখারী হা: নং ৭৫৬)
2. সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য একটি সূরা কিংবা ছোট তিন আয়াত অথবা বড় এক আয়াত মিলানো। (বুখারী হা: নং ৭৭৬, মুসলিম হা: নং ৪৫১)
3. ফরযের প্রথম দুই রাকাআতকে কেব্রাতের জন্য নির্ধারিত করা। (বুখারী হা: নং ৭৭৬, মুসলিম হা: নং ৪৫১)
4. রুকু থেকে উঠে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে এক তাসবীহ পরিমাণ স্থিরভাবে দাঁড়ানো এবং দুই সেজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে স্থিরভাবে বসা এবং তসবীহ পাঠ করা। (বুখারী শরীফ, হা, নং ৮০০ : ৮০১, ৮০২)
5. নামাযের সকল রোকন ধীরে স্থিরভাবে আদায় করা। (আবু দাউদ হা: নং ৮৫৬-৮৫৮)
6. প্রথম বৈঠক করা। (বুখারী হা: নং ৮২৮)
7. উভয় বৈঠকে আন্তাহিয়াতু পড়া। (বুখারী হা: নং ৮৩০, ৮৩১, মুসলিম হা: নং ৪০২, ৪০৩)
8. প্রত্যেক রাকাআতের ফরয এবং ওয়াজিবগুলোর তারতীব বা সিরিয়াল ঠিক রাখা।
9. ফরয ও ওয়াজিবগুলোকে স্ব-স্ব স্থানে আদায় করা। (বাদায়িউস সানায়ে: ১/৬৮৯)
10. বিতরের নামাযে তৃতীয় রাকাআতের ক্বিরাতে পর কোন দুআ পড়া। অবশ্য দুআয়ে কুনূত পড়লে ওয়াজিবের সাথে সাথে সুন্নাতও আদায় হয়ে যাবে।
11. দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলা। (আবু দাউদ হা: নং ১১৫৩)
12. দুই ঈদের নামাযে দ্বিতীয় রাকাআতে অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলার পর রুকুর জন্য ভিন্নভাবে তাকবীর বলা। (ইবনে আকি শাইবা হা: নং ৫৭০৪)
13. ইমামের জন্য যুহর আসর এবং দিনের বেলায় সুন্নাত ও নফল নামাযে ক্বিরা'আত আন্তে পড়া, এবং ফজর, মাগরিব, ইশা, জুমু'আ, দুই ঈদ, তারাবীহ ও রমাযান মাসের বিতর নামাযে ক্বিরা'আত শব্দ করে পড়া। (মারাসীলে আবী দাউদ হা: নং ৪১, মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাক হা: নং ৫৭০০ মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা হা: নং ৫৪৫২)
14. সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করা। (আবু দাউদ হা: নং ৯৯৬)

## ১.৪ । নামাযের সুন্নত সমূহ

### ✓ নামাযের সুন্নত বলতে কী বুঝায়?

**উত্তর:** রাসূল করীম (সা.) নামাযে যেসব কাজ করেছেন বলে প্রমাণিত, তবে এগুলোর প্রতি ফরয ও ওয়াজিবের মত গুরুত্ব দেননি। এগুলোকে নামাযের সুন্নত বলে।

### ✓ নামাযের কোনো সুন্নত যদি ছুটে যায় বা ছেড়ে দেয়, তবে এর হুকুম কি?

**উত্তর:** যদি ভুলবশত কোনো সুন্নত ছুটে যায়, তবে এতে নামায নষ্ট হবে না। সেজদায়ে সাহুও ওয়াজিব হবে না এবং গোনাহও হবে না। তবে নামাযের সুন্নত আদায় করা অতি উত্তম।

### নামাযের সুন্নত গুলো হল:

1. আজান ও ইকামত বলা। (আদুররুল মুখতার মাআ শামী-২/৪৮)
2. তাকবিরে তাহরিমার সময় উভয় হাত উঠানো। (তানভীরুল আবসার মাআ শামী-২/১৮২)
3. হাত উঠানোর সময় আঙ্গুলগুলি স্বাভাবিক রাখা। (ফাতাওয়া শামী-২/১৭১)
4. ইমাম তাকবীরে তাহরীমা ও অন্যান্য তাকবীর প্রয়োজন পরিমাণ উচ্চস্বরে বলা। (হিন্দিয়া-১/১৩০)
5. হাত বাধার সময় বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা। (হিন্দিয়া-১/১৩১)
6. সানা পড়া। (বাদায়েউস সানায়ে- ১/৪৭১)
7. আউযুবিল্লাহ পড়া। (বাদায়েউস সানায়ে- ১/৪৭১)
8. বিসমিল্লাহ পড়া। (বাদায়েউস সানায়ে- ১/৪৭১)
9. ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়া।
10. সূরা ফাতেহা পড়ার পর আমীন বলা।
11. সানা, আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ, আমীন অনুচ্চস্বরে বলা। (হিন্দিয়া-১৩১)
12. রুকু-সেজদায় তিন তিনবার তাসবীহ পড়া।
13. রুকুর অবস্থায় মাথা ও পিঠ নিতম্বের সমান রাখা এবং হাতের আঙ্গুলগুলো খোলা রেখে হাটুতে শক্ত করে ধরা। (বাদায়েউস সানায়ে- ১/৪৮৭)
14. রুকুতে “সুবহানা রব্বিয়াল আযীম” বলা। (বাদায়েউস সানায়ে- ১/৪৭৮)
15. একাকী নামায পাঠকারির জন্য রুকু থেকে উঠার সময় “সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা” ও “রব্বানা লাকাল হামদ” বলা। ইমামের জন্য শুধু “সামিয়া” ল্লাহু লিমান হামিদা” বলা আর মুক্তাদির জন্য শুধু “রব্বানা লাকাল হামদ” বলা। (মারাকিল ফালাহ-২৭৮)
16. সেজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দুই হাটু, এরপর দুই হাত অতঃপর নাখ ও কপাল রাখা।
17. সেজদায় বলা “সুবহানা রব্বিয়াল আ’লা”। (বাদায়েউস সানায়ে- ১/৪৯৪)
18. তাশাহুদে “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলার সময় শাহাদাত(তর্জনি) আঙ্গুল দ্বারা কেবলার দিকে ইশারা করা। (বাদায়েউস সানায়ে-১/৫০১-৫০২)
19. শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর দুরুদ শরীফ পড়া। (বাদায়েউস সানায়ে-১/৫০০)
20. দুরুদ শরীফের পর দোয়ায়ে মাছুরা পড়া। (হিন্দিয়া-১/১৩০)
21. প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে সালাম ফিরানো।

### ১.৫ । নামাযের মুস্তাহাব সমূহ

1. দাঁড়ানো অবস্থায় সেজদার স্থানের দিকে, রুকু অবস্থায় উভয় পায়ের পাতার উপর, সেজদার সময় নাকের দিকে, বৈঠকের সময় কোলের দিকে দৃষ্টি রাখা।(বাদায়েউস সানায়ে-১/৫০৩)
2. তাকবীরে তাহরিমা বলার সময় হাত চাদর থেকে বাহিরে বের করে রাখা।
3. সালাম ফিরানোর সময় উভয় কাঁধের উপর দৃষ্টি রাখা।(মারাকিল ফালাহ-১৫১)
4. নামাযে মুস্তাহাব পরিমান কেরাত (ফজর ও যোহরে তিওয়ালা মুফাস্যাল- সূরা হুজরাত থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত।আছর ও ইশাতে আওসাতে মুফাস্যাল- সূরা তরেক থেকে বায়িনা পর্যন্ত। মাগরীবে কিসারে মুফাস্যাল- সূরা যিলযাল থেকে শেষ পর্যন্ত সূরাগুলোর যেকোনটি) পড়া।(ফাতাওয়া শামী- ২/২৬১)
5. জুমআর দিন ফজরের নামাযে প্রথম রাকাতে সূরা আলিফ-লাম-মিম সেজদা ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা দাহর পড়া।(ফাতাওয়া শামী-২/২৬৫)
6. যথা সম্ভব কাশি ও ঢেকুর চেপে রাখা।(ফাতাওয়া শামী-২/১৭৬)
7. হাই আসলে মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করা।(ফাতাওয়া শামী-২/১৭৭)

### ১.৬ । নামায ভঙ্গের কারণ সমূহ

1. নামাযে কিরাত ভুল পড়া ।
2. নামাযের ভিতর কথা বলা
3. কোন লোককে সালাম দেওয়া
4. সালামের উত্তর দেওয়া
5. উহ-আহ শব্দ করা
6. ইচ্ছা করে কাশি দেওয়া
7. আমলে কাছীড় করা যেমন- মোবাইল বন্ধ করা বা দীর্ঘ সময় নিয়ে শরীর চুলকানো, ইত্যাদি, তবে এক হাত দিয়ে মোবাইল সাইলেন্ট করা যাবে
8. বিপদে অথবা বেদনায় শব্দ করে কাঁদা
9. তিন তাছবীহ পড়ার সময় পরিমাণ সময় ছত্র খুলে থাকা
10. মূকতাদী সাড়া অন্য কারো থেকে নামায সম্পর্কিত কোন শব্দ গ্রহণ করা
11. নাপাক জায়গায় সেজদাহ করা
12. কিবলার দিক হতে সিনা ঘুরে যাওয়া
13. নামাযে কুরআন শরীফ দেখে পড়া
14. নামাযে শব্দ করে হাসা
15. হাঁচির উত্তর দেওয়া
16. নামাযে খাওয়া অথবা পান করা
17. ইমামের আগে দাঁড়ানো

## ১.৭। নামাযের ওয়াক্ত ও রাকাত

মহান আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের উপর দিবানিশি মোট ৫ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। সাথে সাথে এগুলো আদায়ের জন্য তাঁর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হেকমত অনুযায়ী পাঁচটি সময়ও নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যাতে করে বান্দাহ্ এ সময়ানুবর্তিতার মাধ্যমে তার প্রতিপালকের সাথে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। এটা মানব অন্তরের জন্য অনেকটা বৃক্ষের গোড়ায় পানি সিঞ্চনের মত বিষয়। বৃক্ষকে যেমন বেড়ে উঠার জন্য নিয়মিত পানি দিতে হয়; মানব অন্তরকেও স্রষ্টার ভালোবাসায় স্থিতিশীল থাকার জন্য নিয়মিত সালাতের আশ্রয় নিতে হয়। একবারে সব পানি ঢেলে দিয়ে যেমন বৃক্ষের সঠিক প্রবৃদ্ধি আশা করা যায় না, মানব হৃদয়ও তদ্রূপ।

একই ওয়াক্তে পাঁচটি নামায আদায় করা ফরয করা হলে বান্দার মাঝে ক্লান্তি ও বিরক্তিবোধ উদ্বেক হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তাই পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পাঁচটি সালাত আদায় করা ফরয করা হয়েছে- যেন বান্দার মাঝে অবসন্নতা ও বিরক্তিবোধ না আসে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন অধিক প্রজ্ঞাবান। (শায়খ উসাইমীনের 'মুকাদ্দিমাতু রিসালাতু আহকামি মাওয়াকিতুস সালাত')

নাম	সময়	ফরযের পূর্বে	ফরয	ফরযের পর
ফযর	উষাকাল (সুবহে সাদিক) থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত	২ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা	২ রাকাত	-
যোহর	যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে হলে পড়ে তখন থেকে শুরু করে ব্যক্তির সায়া তাঁর সমপরিমাণ হয়ে আসরের ওয়াক্ত না আসা পর্যন্ত	৪ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা	৪ রাকাত	২ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা
আসর	যোহরের শেষ ওয়াক্ত থেকে সূর্য হলুদ বর্ণ পূর্ব পর্যন্ত অন্য মতে সূর্যস্তের পূর্ব পর্যন্ত	-	৪ রাকাত	-
মাগরিব	সূর্যাস্তের পর থেকে গোধূলি (যতক্ষণ না পশ্চিমাকাশের লালিমা অদৃশ্য হয়ে যায়) পর্যন্ত	-	৩ রাকাত	২ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা
ইশা	গোধূলি থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত	-	৪ রাকাত	২ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা
বিতর	ইশার পর থেকে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত	-	-	১ বা ৩ বা ৫
জুম্মা	শুক্রবার যোহরের নামাযের পরিবর্তে দুই রাকাত জুম্মার নামায আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। অবশ্য এর আগে দুইটি খুতবা রয়েছে, যা দুই রাকাত নামাযের স্থলাভিষিক্ত। (আল-মুসান্নাফ লি ইবনে আবি শাইবা : ৫৩৬৭, ৫৩৭৪)। এজন্য খুতবার সময় উপস্থিত থাকা এবং তা শোনার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত।	২ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা	২ রাকাত	মসজিদে পড়লে ৪ রাকাত / বাসায় পড়লে ২ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা (বাসায় পড়াই উত্তম)

## ১.৮। নামাযের নিষিদ্ধ সময় সমূহ

হাদীস সূত্রে জানা যায়, তিন সময়ে নামায পড়া নিষেধ। সাহাবী উকবা বিন আমের জুহানী (রা.) বলেন, ‘তিনটি সময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নামায পড়তে এবং মৃতের দাফন করতে নিষেধ করতেন। সূর্য উদয়ের সময়; যতক্ষণ না তা পুরোপুরি উঁচু হয়ে যায়। সূর্য মধ্যাকাশে অবস্থানের সময় থেকে নিয়ে তা পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত। যখন সূর্য অস্ত যায়’। (সুবুলুস সালাম: ১/১১১, সহীহ মুসলিম: ১/৫৬৮) উক্ত হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী নামাযের নিষিদ্ধ সময় তিনটি।

- ① সূর্যোদয়ের সময়, যতক্ষণ না তার হলুদ রং ভালোভাবে চলে যায় এবং আলো ভালোভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এর জন্য আনুমানিক ১৫ থেকে ২০ মিনিট সময় প্রয়োজন হয়।
- ② ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়, যতক্ষণ না তা পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে।
- ③ সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তবে কেউ যদি ওই দিনের আসরের নামায সঠিক সময়ে পড়তে না পারে, তাহলে সূর্যাস্তের আগে হলেও তা পড়ে নিতে হবে। তবে এটি কাজা হিসেবে পড়তে না।

## ১.৯। নারী ও পুরুষের নামাযের পদ্ধতিতে পার্থক্য

নারী ও পুরুষের সালাতের মধ্যে রাসূল (সা.) কোনো পার্থক্য করেননি। এই মর্মে রাসূল (সা.)-এর কোনো হাদীস কোথাও উল্লেখ করা হয়নি।

বরং রাসূল (সা.) হাদীসের মাধ্যমে যে নির্দেশনা দিয়েছেন, তা হচ্ছে, “তোমরা সালাত আদায় করো, যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ”। (বুখারী হা: নং ৬০০৮)

এই নির্দেশনা নারী ও পুরুষের জন্য সমান। তাই এ ক্ষেত্রে যে পার্থক্য করা হয়ে থাকে, সে পার্থক্যটুকু নিছক ইশতেহাদ বা গবেষণা। এটি দলিল বা ওহিনির্ভর নয়। ফলে এই পার্থক্য করাটা উচিত নয়।

এর জন্য মূলত সুস্পষ্ট দলিল হচ্ছে, আল্লাহর নবী (সা.)-এর নারী সাহাবিয়ার সালাত। যাঁরা নারী সাহাবি ছিলেন, তাঁরা কেউ এই পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেননি। বিশেষভাবে যদি পার্থক্য থাকত, অবশ্যই নবী (সা.) থেকে তাঁরা এই বিষয়টি উল্লেখ করতেন।

অতএব, সুন্নাহ হল— রুকু, সেজদা, ক্বিরাত ও বুকে হাত রাখা ইত্যাদি সবক্ষেত্রে মহিলার নামায পুরুষের নামাযের মত। অনুরূপভাবে রুকুকালে হাঁটুতে হাত রাখার পদ্ধতিও একই। সেজদাকালে কাঁধ বরাবর কিংবা কান বরাবর জমিনে হাত রাখার পদ্ধতিও একই। রুকুকালে পিঠ সোজা রাখার পদ্ধতিও অভিন্ন। রুকু ও সেজদাতে যা পড়া হবে সেগুলো এক। রুকু ও প্রথম সেজদা থেকে উঠে যা বলবে সেটাও এক। এ সব ক্ষেত্রে নারীর নামায পুরুষের নামাযের ন্যায়।

তবে নামাযের বাহিরের কিছু বিষয়ে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক নির্দেশ রয়েছে।

**ইক্বামত ও আযান:** এ দুইটি নামাযের বাহিরের বিষয়। ইক্বামত ও আযান পুরুষের জন্য খাস। এই মর্মে দলিল উদ্ভূত হয়েছে। পুরুষেরা ইক্বামত ও আযান দিবে। আর নারীদের ইক্বামত ও আযান নেই, যেহেতু নারীদের আওয়াজও আওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

**উচ্চস্বরে ক্বিরাত পড়া:** মহিলারা কোন নামাযে উচ্চস্বরে ক্বিরাত পড়তে পারবেন না। পুরুষেরা (জামাতে শুধুমাত্র ইমাম) ফজরের দুই রাকাতে, মাগরিবের প্রথম দুই রাকাতে, এবং এশার প্রথম দুই রাকাতে উচ্চস্বরে ক্বিরাত পড়বেন।

### Related References:

- [https://www.youtube.com/watch?v=KXj\\_0LoSSA](https://www.youtube.com/watch?v=KXj_0LoSSA)
- [https://www.youtube.com/watch?v=3U\\_mIWZKnI&t=10s](https://www.youtube.com/watch?v=3U_mIWZKnI&t=10s)
- <https://www.youtube.com/watch?v=jCazGO0Ofs4>
- <https://www.youtube.com/watch?v=qKSR9uDoT6s>
- [https://www.youtube.com/watch?v=dWX4x\\_nFfas](https://www.youtube.com/watch?v=dWX4x_nFfas)
- <https://www.youtube.com/watch?v=wqx60PeUXv4>



## ২। নামাযের নিয়ম

উত্তম রূপে ওজু করে (ওজু করা ফরয যা ব্যতীত নামায হবে না।) পবিত্র স্থানে কেবলামুখী হয়ে নামাযের জন্য দাড়াতে হবে। নিম্নে নামাযের নিয়ম ধারাবাহিক ভাবে তুলে ধরা হল।

### ২.১। নামাযে দাঁড়ানো

নামাযে যেভাবে মনে চায় সেভাবে দাঁড়ানো যাবে না। কারণ দাঁড়ানোটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, বরং আমি এক মহান সত্তার আদেশ পালনার্থে দাঁড়িয়েছি। আমি যদি আমার ব্যক্তিগত কাজে দাঁড়াই, তাহলে যেভাবে মনে চায় সেভাবে দাঁড়াতে পারতাম।

নামাযে সর্বদা কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। এদিক-ওদিক তাঁকাবে না। দাঁড়ানো অবস্থায় নজর সিজদার স্থানের দিকে রাখতে হবে। মাথা কিঞ্চিৎ ঝুঁকিয়ে রাখতে হবে কিন্তু খুতনি যেন বুকের সাথে লেগে না যায়, ইহা মাকরুহ। নামাযের নিয়ত বাঁধার পূর্ব পর্যন্ত দুই হাত শরীরের দুই পার্শ্বে ছেড়ে রাখবে।

পা এবং পায়ের আঙ্গুল কিবলামুখী রাখতে হবে। দুই পা দুই দিকে করে রাখা যাবে না, বরং দুই পা সোজা সামনের দিকে কিবলা বরাবর রেখে আদবের সাথে দাঁড়াতে হবে।

জামায়াতে নামায পড়ার সময় কাতার সোজা রাখা জরুরি। কাতার সোজা রাখার জন্য প্রত্যেক মুসল্লী তাদের পায়ের গোড়ালির শেষ মাথা এক বরাবরে রেখে দাঁড়াবে। সামনে পিছনে আঁকাবাঁকা অবস্থায় দাঁড়াবে না। কাতার সোজা করে না দাঁড়ালে নামাযের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—  
“তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াও সমান হয়ে দাঁড়াও, অন্যথায় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অন্তরে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে দেবেন।”

পায়জামা বা লুঙ্গি অর্থাৎ পরিধেয় বস্ত্র অবশ্যই টাখনুর উপরে রাখতে হবে। টাখনু ঢেকে কাপড় পরিধান করা পুরুষের জন্য গোনাহের বিষয় এবং এই অবস্থায় নামায সহীহ হবে না। যে ধরণের পোশাক পরিধান করে জনসম্মুখে যাওয়া লজ্জাজনক বোধ হয়, সে ধরণের কাপড় পরিধান করে নামায পড়া মাকরুহ। জামার আন্তিন লম্বা হওয়া উত্তম। আন্তিন গুটিয়ে নামায আদায় করা আদবের খেলাফ এবং মাকরুহ।

### ২.২। নিয়াত

নবী করিম (সা.) বলেছেন, সব আমল নিয়াতের ওপর নির্ভরশীল। মনের যে ইচ্ছা বা সংকল্প, এটাই হলো নিয়াত। যোহরের নামাযের সময় আমরা জায়নামাযে দাঁড়িয়ে মনে ইচ্ছা করলাম, আমরা এখন যোহরের ফরয নামায পড়ছি, এটাই নিয়াত। কিন্তু আমরা অনেকেই নামাযের পূর্বে নিয়াত মুখে উচ্চারণ করি বা পড়ি আদতে যার কোন প্রয়োজন নেই এবং এর কোন দলিলও ইসলামে পাওয়া যায় না।

সুতরাং নামায আদায়ে ইচ্ছুক ব্যক্তি কেবলামুখী হয়ে মহান আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়িয়ে অন্তরে খুশু ও বিনম্রভাবে সৃষ্টি করে অন্তরে নামাযের নিয়াত করবে।

## ২.৩। তাকবিরে তাহরিমা ও হাত বাঁধা

তাকবিরে তাহরিমা নামাযের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন। আল্লাহর বড়ত্বসূচক শব্দ ‘আল্লাহু আকবার’ দিয়ে নামাজ শুরু করাকে তাকবিরে তাহরিমা বলে। এর নিয়ম হলো,

দুই হাতের আংগুল সমূহ ক্রিৎসামুখী খাড়াভাবে কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত উঠিয়ে দুনিয়াবী সবকিছুকে হারাম করে দিয়ে স্বীয় প্রভুর মহত্ত্ব ঘোষণা করে বলবে ‘আল্লাহু আকবার’ (অর্থঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ)। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জিতে ধরে অথবা বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে, হোক তা নাভির নিচে অথবা বুকের উপরে বেঁধে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সম্মুখে নিবেদিত চিন্তে সিজদার স্থান বরাবর দৃষ্টি রেখে দাঁড়াতে হবে। সালাতে কেবল তাশাহুদের বৈঠক সাড়া অন্য সকল অবস্থায় সেজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা সুন্নত। কেবল তাশাহুদের বৈঠকে দৃষ্টি থাকবে ডান হাতের শাহাদাত (তর্জনী) অঙ্গুলীর দিকে।

## ২.৪। সানা

তাকবিরে তাহরিমা ও হাত বাঁধার পর সানা পড়তে হয়। সানা পড়া সুন্নত। নিচের যে কোন একটি সানা পড়া।

① **উচ্চারণ:** সুবহানাকাল্লাহুমা ওয়াবি হামদিকা, ওয়া তাবারা কাসমুকা, ওয়া তাআলা জাদুকা, ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

**অর্থ:** হে আল্লাহ! আমরা আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি, আপনার নাম বরকতময়, আপনার মর্যাদা সর্বোচ্চ, আপনি সাড়া কোনো উপাস্য নেই।

**সূত্র:** আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) নামাজ শুরু করার সময় এই দোয়া পড়তেন। (সুনানে তিরমিযি, হাদিস : ২৪২)

② **উচ্চারণ:** আল্লাহুমা বাই’দ বায়নী ওয়া বায়না খাতাইয়া ইয়া, কামা বাআ’দতা বাইনাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিবি। আল্লাহুমা! নাককিনি মিন খতায় কামা ইউনাককিউস সাওবুল অবইয়াদু মিনাদ-দানাসি, আল্লাহুমাগসিল খতাইয়া ইয়া বিল মায়ি’ ওয়াছ সালজি ওয়াল বারাদ।

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّلَجِ وَالْبَرْدِ

**অর্থ:** হে আল্লাহ! আপনি আমার ও আমার পাপগুলোর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আমাকে গুনাহ এমনভাবে পরিষ্কার করে দেন যেমন সাদা কাপড় ধুলে পরিষ্কার হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার পাপগুলো থেকে ধুয়ে দিন (পবিত্র করুন) করুন বরফ, পানি ও শিশির দ্বারা।

**সূত্র:** আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকবির ও কিরাতের মধ্যে চুপ করে ছিলেন। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি এই পাঠ করার কথা জানান। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭৪৪)

③ **উচ্চারণ:** ওয়াজ্জাহতু ওয়াজ্জাহিয়া লিল্লাজি ফাতারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল-আরদা হানিফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকিন। ইল্লা সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, লা শারিকা লাহু ওয়া-বিজালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমিন। আল্লাহুম্মা আনতাল মালিকু লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আনতা রাব্বি ওয়া আনা আবদুকা, জলামতু নাফসি ওয়া-তারাতু বিজামবি, ফাগফিরলি জুনুবি জামিয়া; ইল্লাহু লা ইয়াগফিরুজ্ জুনুবা ইল্লা আনতা, ওয়াহদি নি লি-আহসানিল আখলাকি লা ইয়াহদি লি-আহসানিহা ইল্লা আনতা, ওয়াসরিফ আননি সাইয়িয়াহা লা ইয়াসরিফু আননি সাইয়িয়াহা ইল্লা আনতা, লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা ওয়াল খাইরু কুল্লু ফি ইয়াদাইকা, ওয়াশ শাররু লাইসা ইলাইকা, আনা বিকা ওয়া ইলাইকা, তাবারাকতা ওয়া তালাইতা, আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা।

**অর্থ :** আমি একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর অভিযুগী হলাম—যিনি আসমান ও জমিনগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমার সালাত, কুরবানি, জীবন ও মৃত্যু বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য, যার কোনো শরিক নেই। আর আমি এ বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের একজন। হে আল্লাহ! আপনিই বাদশাহ, আপনি সাড়া কোনো উপাস্য নেই। আপনি আমার প্রতিপালক এবং আমি আপনার বান্দা। আমি নিজের ওপর অবিচার করেছি এবং আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব আমার গুনাহ মাফ করে দেন। আপনি সাড়া কেউই গুনাহ ক্ষমাকারী নেই। আমাকে উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করেন। আপনি সাড়া কেউ উত্তম চরিত্রের দিশা দিতে পারে না। আমার থেকে চরিত্রের মন্দ দিকগুলো দূরে রাখুন। আপনি সাড়া কেউ আমার থেকে চরিত্রের মন্দ দিকগুলো দূরে রাখতে পারে না। আমি আপনার কাছে হাজির। আনুগত্য আপনারই জন্য নিবেদিত। সব কল্যাণ আপনার হাতে, অকল্যাণ আপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। আমি আপনার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। আপনি মঙ্গলময়, আপনি সুমহান। আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি এবং আপনার কাছে তওবা করছি।

**সূত্র :** আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) নামাজে দাঁড়িয়ে তাকবির বলার পর এই দোয়া পাঠ করতেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৯০০)

উল্লেখ্য, দোয়াটি জায়নামাযের দোয়া হিসেবে পরিচিত থাকলে হাদিসে দোয়াটি সানার পরিবর্তে পড়ার কথা পাওয়া যায়।

## ২.৫। তাউজ ও তাসমিয়া

সানা পড়ার পর অনুচ্চস্বরে তাউজ ( আউজুবিল্লাহ ) ও তাসমিয়া ( বিসমিল্লাহ ) পড়া সুনত।

### তাউজ:

“আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম”

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

**অর্থ :** বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

### তাসমিয়া:

“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**অর্থ :** পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

## ২.৬। সূরা ফাতিহা ও কেয়াত

তাউজ ( আউজুবিল্লাহ ) ও তাসমিয়া ( বিসমিল্লাহ ) পড়ার পর সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করতে হয়। সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব এবং সূরা ফাতিহা শেষে “আমীন”( অর্থঃ হে আল্লাহ্ আপনি আমার প্রার্থনা কবুল করুন ) বলা সুন্নত।

মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ জরুরি। ইমামের পিছনে মুক্তাদীও সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। কারণ রাসুল (সা.) এর বাণী “যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না, তার নামাজ হবে না”। (বুখারি-মুসলিম) এ কথাটি ইমাম, মুক্তাদী এবং একাকী নামাজ আদায়কারী সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে। কাজেই সকলকেই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। যেসব নামাজে ইমাম স্বরবে কেয়াত পাঠ করেন, সেসব নামাজে মুক্তাদি ইমামের কেয়াত শ্রবণ করবে এবং নীরবে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। অন্যান্য সূরা পাঠ থেকে বিরত থাকবে।

সূরা ফাতিহা	বাংলা অনুবাদ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ বিসমিল্লাহির রাহমা-নির রহি-ম	শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আ -লামি-ন।	যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ আররহমা-নির রাহি-ম	যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ মা-লিকি ইয়াওমদি-ন	বিচার দিবসের মালিক
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ইয়্যা-কা না'বুদু ওয়া ইয়্যা-কা নাসতাই'-ন	আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ইহদিনাস সিরাতা'ল মুসতাকি'-ম	আমাদের সরল পথ দেখাও
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ সিরাতা'ল্লা যি-না আনআ'মতা আ'লাইহিম গা'ইরিল মাগ'দুবি আ'লাইহিম ওয়ালা দ-ল্লি-ন	সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে

### কেয়াত:

প্রত্যেক ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাতে এবং অন্য সকল নামাযে সূরা ফাতিহার পর পবিত্র কোরআনের যে কোনো জায়গা থেকে তিলাওয়াত বা অপর একটি সূরা পাঠ করতে হয়। সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য একটি সূরা কিংবা ছোট তিন আয়াত অথবা বড় এক আয়াত মিলানো ওয়াজিব। (বুখারী হা: নং ৭৭৬, মুসলিম হা: নং ৪৫১)

## ২.৭। রুকু

এরপর তাকবীর ‘আল্লাহু আকবার’ দিয়ে রুকুতে যেতে হবে। রুকু করা ফরয। রুকুতে দুই হাঁটুর ওপর দু হাতের আঙ্গুলগুলো প্রশস্ত করে এমনভাবে রাখবেন, মনে হবে যেন সে তা ধরে আছে। মাথা ও পিঠ সমান্তরাল রাখবেন। রাসুল (সা.) রুকু অবস্থায় পিঠকে সমান করে প্রসারিত করতেন। এমন সমান করতেন যে, তাতে পানি ঢেলে দিলেও তা যেন স্থির থাকে।

## রুকুর তাসবিহ:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ সুবহা-না রব্বিয়াল আযিম	অর্থ: আমি আমার মহিমান্বিত প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।
---	---

রুকুতে কমপক্ষে তিনবার এই তাসবিহ পড়া সুন্নত। তার অধিকও পড়া যেতে পারে।

## রুকু থেকে ওঠার সময় যে তাসবিহ পড়তে হয়:

অতঃপর রাসুল (সা.) রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে। তিনি নিম্নের দোয়া বলতে বলতে রুকু হতে মাথা উঠাতেন,

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ	অর্থ: আল্লাহ সে ব্যক্তির কথা শোনেন যে তাঁর প্রশংসা করে।
---	---

জামাতে শুধু ইমাম এই তাসবিহ পাঠ করবেন এবং মুক্তাদিরা শুনবেন এবং পরবর্তী তাসবিহ পাঠ করবেন।

## রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর যে তাসবিহ পড়তে হয়:

তিনি যখন রুকু হতে মাথা উঠাতেন, তখন এমনভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতে যে, মেরুদন্ডের হাড়গুলো স্ব-স্ব স্থানে ফিরে যেত। অতঃপর তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেন,

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ রাব্বানা লাকাল হাম্দ	অর্থ: হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমার জন্য। (বুখারী হাদিস নং ৭৯৬)
---	--

অথবা,

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ রব্বানা ওয়া লাকাল হামদু হামদান কাছীরান ত্বায়্যিবান মুবা-রাকান ফীহি।	অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আর আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা; অটেল, পবিত্র ও বরকত-রয়েছে-এমন প্রশংসা। (বুখারী হাদিস নং ৭৯৯)
---	--

মুক্তাদি ও ইমাম উভয়েই তাসবিহ দুটির যেকোনো একটি পাঠ করবে। হাদিস হতে দ্বিতীয় তাসবিহটি পাঠ করার বেশি ফযিলত পাওয়া যায়। হাদিসটি নিম্নরূপ,

রিফা‘আ ইব্নু রাফি‘ যুরাকী (রাঃ) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, একবার আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পিছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি যখন রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বললেন, তখন পিছন থেকে এক সাহাবী 'رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ' বললেন। সালাত শেষ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে এরূপ বলেছিল? সে সাহাবী বললেন, আমি। তখন রাসুল (সা.) বললেন: আমি দেখলাম ত্রিশ জনের অধিক মালাইকা এর সওয়াব কে পূর্বে লিখবেন তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করছেন।

রুকুর পর পঠিতব্য দু‘আর মর্যাদার কারণে এর সওয়াব লেখার জন্য মালাইকাদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। তাই রুকু হতে উঠে এই দু‘আটি পাঠ করা অধিক মর্যাদাপূর্ণ যা অনেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে অনেকে না জানার কারণে পড়েন না। (বুখারী হাদিস নং ৭৯৯)

## ২.৮। সেজদাহ ও দুই সেজদার মধ্যবর্তী বৈঠক

এরপর তাকবির তথা আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় যান। দুই সিজদাহ করা ফরজ। সিজদাহ হবে সাতটি অঙ্গের উপর। অঙ্গগুলো হলো: নাক সহ কপাল, উভয় হাতুলী, উভয় হাঁটু এবং উভয় পায়ের আঙ্গুলের ভিতরের অংশ।

সিজদায় যাওয়ার সময় দুই হাঁটু প্রথমে রাখবে, এরপর হাত, এরপর কপাল ও নাক। দুই হাত কান বরাবর অথবা কাঁধ বরাবর কেবলামুখী করে বিছিয়ে দেবে। দুই কনুই জমিন থেকে উঁচিয়ে রাখবে। বাহুর উর্ধ্বাংশ বগল, পেট ও রান থেকে দূরে রাখবে।

### সেজদাহর তাসবিহ:

<p>سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা</p>	<p>অর্থ: আমি আমার মহিমাম্বিত প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।</p>
---	---

সেজদায় কমপক্ষে তিনবার এই তাসবিহ পড়া সুন্নত। তার অধিকও পড়া যেতে পারে।

**সেজদাহ থেকে উঠা:** সেজদাহ হতে উঠার সময় সর্বপ্রথম কপাল তারপর নাক তারপর হাত উঠবে। (আল্লাহু আকবার) বলে সিজদাহ থেকে মাথা উঠাবেন। বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসবেন এবং ডান পা খাড়া করে রাখবেন। দু'হাত তার উভয় রান (উরু) ও হাঁটুর উপর রাখবেন।

### দুই সেজদার মাঝখানে বসা অবস্থায় দোয়া পড়া :

দুই সেজদার মাঝখানে বসা অবস্থায় রাসূল (সা.) দোয়া করতেন। নিম্নের দোয়া গুলো তিনি করেছেন,

<p>হজরত হুজায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই সেজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে এ দোয়াটি পড়তেন-</p> <p>رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي</p> <p>উচ্চারণ: রব্বিগফির লী, রব্বিগফির লী</p>	<p>অর্থ: হে আমার রব্ব! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। হে আমার রব্ব! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।</p> <p>সূত্র: আবু দাউদ ১/২৩১, নং ৮৭৪; ইবন মাজাহ নং ৮৯৭। আরও দেখুন, সহীহ ইবন মাজাহ, ১/১৪৮।</p>
<p>হজরত ইবনে আব্বার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই সেজদার মাঝে বলতেন-</p> <p>اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي</p> <p>উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফিরলি, ওয়ারহামনি, ওয়াহদিনি, ওয়া আফিনি, ওয়ারযুকনি।</p>	<p>অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি রহম (দয়া) করুন, আমাকে হেদায়েত দান করুন, আমাকে শান্তি দান করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন।</p> <p>সূত্র: মুসলিম, মিশকাত ► <a href="https://www.youtube.com/watch?v=VVLFTMW_g_w">https://www.youtube.com/watch?v=VVLFTMW_g_w</a></p>
<p>হাদীসটি নাসাঈ ব্যতীত সুনান গ্রন্থগারগণ সবাই সংকলন করেছেন,</p> <p>اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَاجْبُرْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي، وَارْزُقْنِي، وَارْزُقْنِي</p> <p>উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগফির লী, ওয়ারহামনী, ওয়াহদিনী, ওয়াজবুরনী, ওয়া আফিনি, ওয়ারযুকনী, ওয়ারযুকনী, ওয়ারযুকনী।</p>	<p>অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি রহম (দয়া) করুন, আমাকে হেদায়েত দান করুন, আমার সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দিন, আমাকে নিরাপত্তা দান করুন, আমাকে রিযিক দান করুন এবং আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন।</p> <p>সূত্র: আবু দাউদ, ১/২৩১, নং ৮৫০; তিরমিযী, নং ২৮৪, ২৮৫; ইবন মাজাহ, নং ৮৯৮।</p>



**দ্বিতীয় সিজদাহ:** তাকবির (আল্লাহু আকবার) বলে দ্বিতীয় সিজদাহ করবে। এবং দ্বিতীয় সিজদায় তাই করবেন প্রথম সিজদায় যা করেছিলেন। সেজদাহ শেষ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আবার সানা ব্যতীত প্রথম রাকাতের মত ২য় রাকাতের সিজদাহ পর্যন্ত ছুবু পড়বেন।

## ২.৯। আরামের বৈঠক

তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামায হলে ২য় রাকাতের সিজদাহ থেকে তাকবির(আল্লাহু আকবার) বলে মাথা উঠাবেন এবং ক্ষণিকের জন্য বসবেন, যে ভাবে উভয় সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে বসেছিলেন। এ ধরনের পদ্ধতিতে বসাকে 'জলসায়ে ইসতেরাহা' বা আরামের বৈঠক বলা হয়। বসা অবস্থায় চোখের দৃষ্টি হাতের উপর রাখা এবং আঙ্গুলগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা ও বাম পায়ে উপর বসে ডান পা খাড়া রেখে আঙ্গুলগুলি ভাজ করে কিবলামুখী করে রাখতে হবে। এসময় তাশাহুদ ( আত্তাহিয়্যাতু ) পাঠ করতে হবে এবং তারপর দাঁড়িয়ে বাকি রাকাত গুলি আদায় করতে হবে। তাশাহুদে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলার সময় শাহাদাত(তর্জনি) আঙ্গুল দ্বারা কেবলার দিকে ইশারা করা। (বাদায়েউস সানায়ে-১/৫০১-৫০২)

ফরয নামায হলে বাকি রাকাতে শুধু সূরা ফাতিয়া পাঠ করতে হবে। কিন্তু সুন্নত বা নফল হলে কেবল (সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য একটি সূরা কিংবা ছোট তিন আয়াত অথবা বড় এক আয়াত) পড়তে হবে।

### তাশাহুদ:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

উচ্চারণ: আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্ সালাওয়াতু, ওয়াত্ তাইয়্যিবাতু। আস্ সালামু 'আলাইকা আইয়্যুহান নাবীয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আস্ সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন। আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আননা মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রসূলুহু।

অর্থ: মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সমস্ত ইবাদত আল্লাহু জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হউক। আমাদের উপর এবং নেক বান্দাদের উপরও শান্তি অবতীর্ণ হউক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল।

## ২.১০। শেষ বৈঠক

নামাযের সালাম ফিরানোর পূর্বের বৈঠককে শেষ বৈঠক বলা হয়। শেষ বৈঠকে তাশাহুদ ( আত্তাহিয়্যাতু ) পাঠ করা ওয়াজিব। তাশাহুদের পর দুরুদ শরীফ পাঠ করা এবং তারপর দোয়ায় মাসুরা পড়া সুন্নত। বসা অবস্থায় চোখের দৃষ্টি হাতের উপর রাখা এবং আঙ্গুলগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা ও বাম পায়ে উপর বসে ডান পা খাড়া রেখে আঙ্গুলগুলি ভাজ করে কিবলামুখী করে রাখতে হবে।

### দুরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

উচ্চারণ: আললাহুন্না সাললিআলা মুহাম্মাদিঁ ওয়া আলা আলি মুম্মাদিন কামা সাললাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামিদুম্মাজীদ। আললাহুন্না বারিক আলা মুহাম্মাদিঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামিদুম্মাজীদ।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেভাবে রহমত বর্ষণ করেছেন ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহা সম্মানিত। হে আল্লাহ! বরকত অবতীর্ণ করুন মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর, যেভাবে আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি। নিশ্চয়ই আপনি মহা প্রশংসিত ও সম্মানিত।

#### দোয়ায়ে মাসুরা:

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاعْفِرْ لِي  
مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

উচ্চারণ: আল্লাহুন্না ইন্নী য়ালামতু নাফসী যুল্মান কাসীরাওঁ ওয়ালা ইয়াগ ফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা; ফাগফির লী মাগফিরাতাম মিন ইন্দিকা ওয়ার হামনী ইন্নাকা আন্তাল গফুরুর রাহীম।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আমার নিজ আত্মার উপর বড়ই অত্যাচার করেছি, গুনাহ মাফকারী একমাত্র তুমিই; অতএব তুমি আপনা হইতে আমাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি দয়া কর। তুমি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল দয়ালু।

### ২.১১। সালাম ফেরানো

দোয়ায়ে মাসুরা পড়ার পর সালাম ফেরানোর মাধ্যমে নামায শেষ করতে হয়। 'আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লা-হ্' বলে প্রথমে ডান দিকে পরে বাম দিকে সালাম ফিরাবে। সালাম ফিরানো ওয়াজিব।

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

উচ্চারণ: আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লা-হ্  
অর্থ: তোমাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

তিনি এতটা মুখ ফিরাতেন যে, (পেছন থেকে) তাঁর ডান গালের শুভ্রতা দেখা যেত। অতঃপর বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে অনুরূপ বলে সালাম ফিরতেন। আর এতেও তাঁর বাম গালের শুভ্রতা (পেছন থেকে) দেখা যেত। (মুসলিম, সহীহ ৫৮২, আবূদাউদ, সুনান ৯৯৬ নং, নাসাঈ, সুনান)

রাসূল (সা) বলেছেন, সালাত আদায়কারী তার ডানে এবং বামে থাকা ভাইদেরকে সালাম প্রদান করবে (মুসলিম হা/৪৩১; ছহীহুল জামে' হা/৪০১৯)। অতএব সালাম ফিরানোর সময় ডানে এবং বামে থাকা ভাইদেরকে সালাম প্রদানের নিয়ত করবে। আর যদি একাকী সালাত আদায় করে, তাহ'লে ডানে ও বামে থাকা ফেরেশতাদের সালাম প্রদানের নিয়ত করবে। (ইমাম নববী, আল-মাজমু' ৩/৪৫৬, ৪৬২; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১/৩২৬, ৩২৭; শায়খ ওসাইমীন, শারহুল মুমতে' ৩/২০৮)



### ৩.১। সালাম ফেরানোর পূর্বের দোয়া

সালাম ফিরানোর আগে ৪টি জিনিস থেকে রাসূল (সাঃ) স্বয়ং পানাহ চাইতেন এবং পানাহ চাইতে বলেছেন। এগুলো হল- কবরের আজাব, জাহান্নামের আজাব, দুনিয়ার ফেতনা ও মৃত্যুর সময়ের ফেতনা এবং দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকা।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ৪টি জিনিস থেকে বাঁচার জন্য ফরয, নফল বা সুন্নত, যেকোনো সালাতে তাশাহুদ ও দুরুদেদের পরে সালাম ফিরানোর আগে এই দুয়া পড়তে বলেছেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ،  
وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ

**উচ্চারণ:** আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন আ'যাবিল ক্বাবরি; ওয়া মিন আ'যাবি জাহান্নাম;  
ওয়ামিন ফিতনাতিল মাহ'ইয়া ওয়াল্ মামাত; ওয়ামিন সাররি ফিতনাতিল্ মাসীহি'দ-দাজ্জাল।

**অর্থ:** হে আল্লাহ! তুমি আমাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করো, আমাকে জাহান্নামের আযাব, এবং দুনিয়ার ফিৎনা ও মৃত্যুর ফেতনা এবং দাজ্জালের ফিৎনা থেকে রক্ষা করো।

[সূত্র: বুখারী ২১০২, মুসলিম ১/৪১২, হিসনুল মুসলিম, পৃষ্ঠা - ৯০।]

### ৩.২। ফরয নামাযের পর প্রয়োজনীয় কিছু তাসবিহ

তাসবিহ বলতে আল্লাহতায়ালায় গুণকীর্তন ও মহিমা প্রকাশ করাকে বুঝায়। দোয়া করা ও তাসবিহ পাঠের উত্তম সময় হলো ফরয নামাজের পরের সময়। তাসবিহ পাঠের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালাকে স্মরণ করার পাশাপাশি ইবাদতকারী আল্লাহতায়ালায় শান ও মান বর্ণনা করেন। আর দোয়ার মাধ্যমে বান্দার চূড়ান্ত বিনয়, আকুতি ও অসহায়ত্ব প্রকাশ পায়।

প্রতি ওয়াক্তের ফরয নামাজের পর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্বপূর্ণ জিকির ও দোয়া পড়তেন। বিশ্বনবী (সা.) এর পঠিত দোয়াগুলো তুলে ধরা হলো-

১। রাসূলুল্লাহ সাঃ প্রত্যেক ফরয নামায শেষে ১ বার “আল্লা-হু আকবার” (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) এবং ৩ বার ইসতেগফার করতেন। (মুসলিমঃ ১২২২)

ইসতেগফার: اَسْتَغْفِرُ اللهَ

উচ্চারণ: আসতাগফিরুল্লাহ্

**অর্থ:** হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

২। তারপর ১ বার পড়তেন,

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

**উচ্চারণ:** আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম, তাবারকতা ইয়া যাল-জালা-লী ওয়াল ইকরাম।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময়, তোমার কাছ থেকেই শান্তি অবতীর্ণ হয়। তুমি বরকতময়, হে পরাক্রমশালী ও মর্যাদা প্রদানকারী। (মুসলিম, ১২২১, মুসলিম ১/২১৮, আবু দাউদ ১/২২১)

### ৩.৩। মোনাজাত

#### ৪। নামাযের সময় কিছু সাধারণ ভুল

অনেকেই জামাতের সঙ্গে মসজিদে নামায পড়তে গিয়ে কতগুলো সাধারণ ভুল করে থাকেন। যে ভুলগুলোকে অনেকে আবার ভুলও মনে করেন না।

এমনকি দীর্ঘদিন ধরে যারা নিয়মিত নামায পড়েন তারাও অবলীলায় এসব ভুল করে থাকেন। ভুল করতে করতে এমন অবস্থা হয়েছে যে, এখন এ ভুলগুলোকেই সঠিক নিয়ম বলে মনে হয়।

যদিও এ ভুলগুলো শোধরানো সংশ্লিষ্ট ইমামের দায়িত্ব। কিন্তু ইমামের কাছে সমস্যাগুলো প্রকাশ না করায় তা থেকেই যাচ্ছে। অভিজ্ঞ আলেমদের অভিমত হলো, এসব ভুলের অনেকগুলোই রাসূলের সুন্নতের খেলাফ। আবার কোনো কোনো ভুল তো নামাযই নষ্ট করে দিতে পারে।

এবার দেখা যাক কোন ধরনের ভুলগুলো হয়ে থাকে-

**১। তাড়াহুড়া করে অজু করা:** অজুর ফরয চারটি। মুখমন্ডল ধৌত করা, উভয় হাত কনুইসহ ধোঁয়া, মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা এবং উভয় পা টাখনুসহ ধোয়া। এগুলো সঠিকভাবে আদায় করতে হবে। হাত-পা, মুখমন্ডলের নির্দিষ্ট স্থানে পানি পৌঁসাতে হবে। কোনো জায়গা শুকনো থাকলে অজু হবে না। তাই তাড়াহুড়া করে অজু না করা ভালো। অজু শেষে কালেমা শাহাদাত পড়া যেতে পারে। হাদিসে এসেছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অজু শেষে কালেমা শাহাদাত পাঠ করবে তার জন্য জাম্মাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে এর যে কোনো দরজা দিয়ে (জাম্মাতে) প্রবেশ করতে পারবে।' (মুসলিম শরিফ)

**২। নিয়াত পড়া:** নবী করিম (সা.) বলেছেন, সব আমল নিয়াতের ওপর নির্ভরশীল। এখন নিয়াত কাকে বলে, সেটা বুঝতে হবে। মনের যে ইচ্ছা বা সংকল্প, এটাই হলো নিয়াত। যোহরের নামাযের সময় আমরা জায়নামাযে দাঁড়িয়ে মনে ইচ্ছা করলাম, আমরা এখন যোহরের ফরয নামায পড়ছি, এটাই নিয়াত। কিন্তু আমরা অনেকেই নামাযের পূর্বে নিয়াত মুখে উচ্চারণ করি বা পড়ি আদতে যার কোন প্রয়োজন নেই এবং এর কোন দলিলও ইসলামে পাওয়া যায় না।

**২। নামাযের জন্য দৌঁড়ে যাওয়া:** অনেকেই নামাযের জন্য মসজিদে দৌঁড়ে যান। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্রুত হাঁটা দৌঁড়ের কাসাকাছি বা দৌঁড় দিয়েও অনেকে নামাযে পৌঁছে হাঁপাতে হাঁপাতে কাতারে দাঁড়িয়ে যান। এই হাঁপানো অবস্থাতেই এক রাকাতের মতো চলে যায়। এটা আল্লাহর রাসূল (সা.) পছন্দ করেননি। তিনি নিষেধ করেছেন। আপনি হয় সময় নিয়ে নামায পড়তে যাবেন অথবা ধীরস্থির ও শান্তভাবে হেঁটে গিয়ে যতটুকু জাম্মাতে শরিক হতে পারেন হবেন এবং বাকি নামায নিজে শেষ করবেন।

হযরত আবু কাতাদা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার আমরা নবী (সা.)-এর সঙ্গে নামায পড়ছিলাম, নামাযরত অবস্থায় তিনি লোকের ছুটাছুটির শব্দ অনুভব করলেন। নামাজা শেষে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি করছিলে? তারা আরজ করল, 'আমরা নামাযের জন্য তাড়াতাড়ি আসছিলাম। আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন, এরূপ কখনো করো না। শান্তিশৃঙ্খলা ও ধীরস্থিরভাবে নামাযের জন্য আসবে, তাতে যে কয় রাকাত ইমামের সঙ্গে পাবে পড়ে নেবে, আর যা ছুটে যায় তা ইমামের নামাযের পর পুরা করে নেবে।' (বোখারি শরীফ, খ-১, হাদিস নম্বর- ৩৮৭)

এই হাদিসে রাসূল (সা.) নামাযে আসার এবং নামাযে शामिल হওয়ার সুনির্দিষ্ট নিয়ম বলে দিয়েছেন যে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে ধীরস্থিরভাবে হেঁটে মসজিদে আসতে হবে, কোনো তাড়াহুড়া করা যাবে না।

**৩। ফজরের সুন্নতে তাড়াহুড়া করা:** ফজরের নামাযের জামাতে অংশ নেয়ার জন্য ফজরের ফরজের আগের সুন্নত নামায সংক্ষিপ্তভাবে শেষ করে জামাতে ইমামের সঙ্গে দাঁড়ানোর চিত্র হরহামেশাই দেখা যায়। এমন অযাচিত তাড়াহুড়া নিষেধ, এমন অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে হাদিসে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে এবং সেটাই মান্য। সেই নির্দেশনা হলো, যদি কেউ ফজরের জামাতের আগে মসজিদে যেতে পারেন তাহলে প্রথমে সুন্নত দুই রাকাত পড়ে জামাতের জন্য অপেক্ষা করবেন। আর যদি দেরি হয়ে যায় এবং জামাত শুরু হয়ে যায় তাহলে প্রথমে মসজিদে গিয়ে ইমামের সঙ্গে জামাতে शामिल হতে হবে এবং জামাতের পর বাকি নামায (যদি থাকে) শেষ করতে হবে।

ফজরের ছুটে যাওয়া সুন্নত আদায় করতে আপনি অপেক্ষা করবেন সূর্য উদয়ের জন্য এবং সূর্য উদয়ের পর নামাযের নিষিদ্ধ সময় (সাধারণত সূর্য উদয়ের পর ২০মিনিট) পার হওয়ার পর আপনি ফজরের সুন্নত নামায আদায় করবেন। মধ্যবর্তী যে সময় সে সময় আপনি হয় মসজিদে বসে অপেক্ষা করতে পারেন অথবা ঘরেও ফিরে আসতে পারেন এবং সময় হওয়ার পরই আপনি ফজরের সুন্নত আদায় করে নেবেন। এটাই আল্লাহর রাসূল (সা.) নির্দেশিত নিয়ম।

**৪। কাতার পূর্ণ না করে নতুন কাতার করা:** সামনের কাতারে দাঁড়ানোর জায়গা আছে। সে জায়গায় না দাঁড়িয়ে অনেকেই নতুন কাতার শুরু করেন। ফলে কাতারের ডান কিংবা বাম দিক অপূর্ণ থাকে। মুসল্লি থাকা সত্ত্বেও কাতার পূর্ণ হয় না। এভাবে কাতার অপূর্ণ রাখা ঠিক নয়। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কাতার মিলিত করে আল্লাহ তার সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ে দেন, আর যে ব্যক্তি কাতার বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহ তার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেন।' (নাসায়ি)

**৫। মানুষ ডিঙিয়ে সামনের কাতারে যাওয়া:** সামনের কাতারে নামায পড়লে সওয়াব বেশি। হয়তো এ কারণে শুক্রবার কিংবা রমজানে তারাবির নামাযে এসে একদল মানুষ চাপাচাপি করে সামনে গিয়ে বসে। জায়গা না থাকা সত্ত্বেও অনেকটা আরেকজনের গায়ের ওপর বসে পড়ে। এতে আরেক মুসল্লির কষ্ট হয়। এটা ইসলামসম্মত নয়। কারণ এক মুসলমান আরেক মুসলমানকে কষ্ট দিতে পারে না। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'প্রকৃত মুসলমান ওই ব্যক্তি যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত মোমিন সেই ব্যক্তি যাকে মানুষ নিজেদের জীবন ও ধনসম্পদের ব্যাপারে নিরাপদ এবং নির্বিঘ্ন মনে করে।' (তিরমিজি ও নাসায়ি)

**৬। কাতারে জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখা:** অনেকে আবার অনেক জায়গা নিয়ে নামাযে দাঁড়ান। একটু চেপে যদি আরেক মুসলমান ভাইকে দাঁড়ানোর জায়গা দেয়া যায়, তবে সেটা ভালো নয় কি? মসজিদ আল্লাহর ঘর। এখানে সবার অধিকার সমান। মুরব্বি দোহাই দিয়ে সামনের কাতারে জায়গা রাখা ঠিক নয়। জায়নামায বিসানো কিন্তু লোক নেই। জিজ্ঞেস করলে জানা যায়, অমুক সাহেব জায়গা রেখে গেছেন। এটা ঠিক না। এমন কাজ খুবই খারাপ।

**৭। তাকবিরে তাহরিমা না পড়ে রুকুতে যাওয়া:** প্রচলিত আরেকটি ভুল হলো, তাকবিরে তাহরিমা (আল্লাহ আকবার) না বলে রুকুতে চলে যাওয়া। অর্থাৎ জামাতের নামাযে ইমাম যখন রুকুতে যান, তখন অনেকে দেখা যায় যে রাকাত পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করে একটি তাকবির (আল্লাহু আকবার) বলতে বলতে রুকুতে চলে যান এ পদ্ধতি সঠিক নয়। কারণ যে তাকবিরটি বলতে বলতে মুসল্লি রুকুতে যাচ্ছে, সেটাকে রুকুর তাকবির বলা যায়। তাহলে তার তাকবিরে তাহরিমা তো আদায় হয়নি। অথচ তাকবিরে তাহরিমা ফরয।

অতএব ইমামকে রুকুতে পেতে হলে কয়েকটি কাজ করা জরুরি। প্রথমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে একবার আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করবে। তারপর হাত না বেঁধে সোজা ছেড়ে দিবে। অতপর আরেকটি তাকবির (আল্লাহু আকবার) বলতে বলতে রুকুতে যাবে। সারকথা এই যে, এখানে তাকবির দুটি। প্রথমটি তাকবিরে তাহরিমা, যা নামাযের প্রথম কাজ। এই তাকবির না বললে নামায হবে না। আর দ্বিতীয়টি রুকুর তাকবির। এই তাকবির বলা সুন্নত। কেউ যদি রুকুতে ইমামের সাথে शामिल হতে চায় তাহলে তার জন্য নিয়ম মাহফিক এই দুটি তাকবির আদায় করা উচিত। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে রুকুর তাকবির তো সাড়া যেতে পারে, কিন্তু স্থির দাঁড়ানো অবস্থায়

তাকবিরে তাহরিমা (আল্লাহু আকবার) অবশ্যই বলতে হবে। এ বিষয়ে অধিক তাড়াহুড়া বা অবহেলা করলে নামায শুদ্ধ না হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। (ফতোয়া শামি: ১/৪৪২-৪৫২, আল বাহরুর রায়েক: ২/২৭৬)

**৮। সানা পড়া নিয়ে বিভ্রান্তি:** অনেকেই ভাবেন ইমামকে রুকুতে পেরে সানা পড়তে হবে কি না- বিষয়টি নিয়ে অনেকেই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগেন। বস্তুত সানা পড়া সুন্নত। নামাযে নিয়ত বাঁধার পর প্রথম কাজ হলো সানা পড়া। কেউ একা পড়ুক বা জামাতে নামায পড়ুক, উভয় অবস্থায় সানা পড়তে হয়। ইমাম আস্তে কেরাত পড়া অবস্থায় ইমামের সঙ্গে নিয়ত বেঁধে সানা পড়তে পারে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আর ইমাম জোরে কেরাত পড়া অবস্থায় কেরাত শুনা ফরয বিধায় তখন সানা পড়া নিষেধ। কিন্তু এক্ষেত্রে অনেকের যে ভুলটা হয়ে থাকে তা হলো, ইমামকে যদি রুকুতে পায় তাহলে প্রথমে তাকবির বলে হাত বাঁধে তারপর দ্রুত সানা পড়ে রুকুতে যায়। অনেক সময় সানা পড়তে পড়তে ইমামের রুকু শেষ হয়ে যায় ফলে ওই রাকাত ছুটে যায়। এটা ঠিক নয়। এ অবস্থায় সানা পড়তে হবে না, হাতও বাঁধতে হবে না।

নিয়ম হলো, প্রথমে দাঁড়ানো অবস্থায় দু'হাত তুলে তাকবিরে তাহরিমা (আল্লাহু আকবার) বলে হাত ছেড়ে দেবে, তারপর দাঁড়ানো থেকে তাকবির বলে রুকুতে যাবে। এক্ষেত্রে অনেকে আরেকটি ভুল করে থাকেন সেটা হলো, ইমাম রুকুতে চলে গেছে দেখে দ্রুত রুকুতে শরিক হয়ে রাকাত ধরা দরকার, তা না করে এ সময়ও আরবিতে উচ্চারণ করে নিয়ত পড়তে থাকে। ফলে ওই রাকাত পায় না। এটা আরও বড় ভুল। **নিয়তের বিষয়ে আলেমরা বলেন, নিয়ত অর্থ সংকল্প করা, যা মনে মনে হলেই চলবে। উচ্চারণ করে নিয়ত পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই।** (রদ্দুল মুহতার: ১/৪৮৮)

**৯। নামাজীর সামনে দিয়ে যাওয়া:** ফরয নামাযের পর অনেকে হুমড়ি খেয়ে পড়েন মসজিদ থেকে বের হওয়ার জন্য। জুমার পর তো রীতিমতো হুড়াহুড়ি লেগে যায়। ফরজের পর অনেকেই সুন্নত পড়তে দাঁড়িয়ে যান। তাদের সামনে দিয়ে অনেকেই অবাধে চলে যান। এটা ঠিক না। নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাওয়া সমীচীন নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'নামাযের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী যদি জানত এতে কী পরিমাণ পাপ রয়েছে, তবে তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে ৪০ বছর দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম হতো। হাদিসের বর্ণনাকারী আবু নসর বলেন, আমার মনে পড়ে না ৪০ দিন না ৪০ মাস, না ৪০ বছর বলেছেন।' (সহিহ বোখারি)

**১০। দ্রুত নামায আদায়:** অনেক নামাজীই খুব দ্রুত নামায আদায় করেন। নামায আদায়ের সময় ঠিকমত রুকু-সেজদা না করেই তারা দ্রুত তারা নামায আদায় করেন। রাসূল (সা.) আমাদের যথাযথ আদাবের সাথে যথার্থ সময় নিয়ে আমাদের নামায আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। যথাযথ সময় নিয়ে কিয়াম, রুকু, সেজদা ও বসার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

**১১। রুকু থেকে উঠে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে না দাঁড়ানো এবং দুই সেজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে স্থিরভাবে না বসা:** অনেকেই রুকু থেকে উঠে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে না দাঁড়িয়েই সেজদায় চলে যান এবং দুই সেজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে স্থিরভাবে (সোজা হয়ে) না বসেই পরবর্তী সেজদায় চলে যান। বিনা কারণে এমনটি করা মোটেই উচিত নয়। রুকু থেকে উঠে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে এক তাসবীহ পরিমাণ স্থিরভাবে দাঁড়ানো। এবং দুই সেজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে স্থিরভাবে বসা এবং তসবীহ পাঠ করা ওয়াজিব। যা ছুটে গেলে **সেজদা সাহু** করতে হয়।

বারা'আ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর রুকু ও সেজদা এবং তিনি যখন রুকু হতে মাথা উঠাতেন, এবং দুই সেজদার মধ্যবর্তী সময় সবই প্রায় সমান হত। (সহিহ বোখারি হাঃ ৮০১)

অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় চোর ওই ব্যক্তি যে তার নামায চুরি করে। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে কিভাবে নামায চুরি করে? তিনি বলেন, সে নামাযে রুকু ও সেজদা পূর্ণ করে না।' (মুসনাদে আহামাদ, হাদিস: ২২৬৯৫)

**১২। নামাযে অধিক নড়াচড়া করা:** অধিকাংশ আলেমরাই একমত হয়েছেন, নামাযের মধ্যে অধিক নড়াচড়া ও শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়ানো নামাযকে নষ্ট করতে পারে। এটি যেমন ব্যক্তির নিজের নামাযের খুশুকে নষ্ট করে একইভাবে তা জামায়াতে অন্যের নামাযের মনোযোগ নষ্ট করতে পারে।

কুরআনে মুমিনদের নামায সম্পর্কে বলা হয়েছে, “মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের নামাযে *বিনয় অবলম্বনকারী*।” (সূরা মুমিনুন, আয়াত: ১-২)

**১৩। ইমামের আগে যাওয়া:** জামায়াতে নামাযের সময় ইমামের আগে আগে মুসল্লীর যাওয়া অপর এক সাধারণ ত্রুটি। অনেক মুসল্লীই জামায়াতে নামাযের সময় ইমামের আগে আগে রুকু-সেজদায় চলে যাওয়া বা রুকু-সেজদা থেকে উঠে যান। রাসূল (সা.) জামায়াতে নামায পড়ার সময় স্পষ্টভাবে ইমামকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ইমামের আগে আগে যাওয়ার বিষয়ে সতর্কতা দিয়েছেন।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল (সা.) বলেছেন, “ইমাম অনুসরণ করার জন্য। সুতরাং, তোমরা রুকু কর যখন সে রুকু করে এবং মাথা তোল যখন সে মাথা তোলে।” (বুখারী)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূল (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি ইমামের আগে তার মাথা তোলে তার কি এই ভয় নেই যে আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিবর্তন করে দিতে পারেন বা তার শরীরকে গাধার শরীরে পরিণত করে দিতে পারেন?” (বুখারী)

**১৪। ভুল সেজদা:** সেজদার সময় রাসূল (সা.) স্পষ্টভাবে শরীরের সাতটি অংশকে ভূমির সাথে স্পর্শ করিয়ে সেজদা করার নির্দেশ দিয়েছেন; কপাল সহ নাক, দুই হাত, দুই হাটু এবং দুই পা। অনেকেরই সেজদার সময় এগুলোর কোন কোনটি ভূমি স্পর্শ করেনা। ফলে তাদের সেজদা যথার্থ ভাবে সম্পন্ন হয়না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, “আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সাতটি অঙ্গের মাধ্যমে সেজদা করতে যেমন নাকের অগ্রভাগ সহ কপাল, দুই হাত, দুই হাটু এবং দুই পায়ের পাতা এবং (নামাযে) কাপড় বা চুল নিয়ে খেলোনা।” (বুখারী)

**১৫। সেজদার সময় বাহুকে ভূমির উপর বিছিয়ে দেওয়া:** অনেকে আবার সেজদার সময় হাতের বাহুকে পুরোপুরিভাবে ভূমির উপর বিছিয়ে দেয়। রাসূল (সা.) এভাবে বাহুকে বিছিয়ে দিতে প্রচলিতভাবে নিষেধ করেছেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, “সেজদার সময় তোমাদের বাহুকে ভূমির উপর কুকুরের মত বিছিয়ে দিয়োনা।” (নাসায়ী)

**১৬। সতর ঢাকা না থাকা:** নামাযের সময় অনেকেরই সতর অনাবৃত হয়ে পড়ে। কিন্তু নামাযের প্রধানতম একটি শর্ত হলো সতর ঢাকা। সুতরাং এই বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

**১৭। নামাযে যত্রতত্র তাকানো:** নামায আদায়ের সময় কেউ কেউ নামাযে মনোযোগ না দিয়ে যত্রতত্র তাকাতে থাকেন। এ ধরনের আচরণকারীদের রাসূল (সা.) কঠোর সতর্কতা প্রদান করে এই আচরণ থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, “কি করে কিছু ব্যক্তি নামায আদায়ের সময় তাদের চোখকে আকাশের দিকে তুলতে পারে? নামাযের সময় লোকদের আকাশের দিকে চোখ তোলা থেকে বিরত থাকা উচিত অন্যথায় তাদের দৃষ্টিকে কেড়ে নেওয়া হতে পারে।” (বুখারী)

**১৮। জায়নামাযের দোয়া:** নামাযের আগে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে এই দোয়া পড়া- “আল্লাহুম্মা ইন্নি ওয়াজ্জাহতু ওয়ায হিয়া লিল্লাযি ফাতারাস সামা ওয়াতি ওয়াল আরদ হানীফা ওমা আনা মিনাল মুশরিকীন”- শরীয়তের কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। **মূলতঃ জায়নামাযের দোয়া বলতে শরীয়তে কিছু নেই।** অবশ্য উপরোক্ত দোয়াটি রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো তাহাজ্জুদের নামাযে তাকবীরে তাহরীমার পর সানার স্থানে পড়তেন বলে প্রমাণিত আছে। যেমন, আলী রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ ” وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন (রাতের বেলা) দাঁড়াতেন তখন (তাকবীরে তাহরীমার পর) বলতেন,

“ওয়াজ্জাহতু ওয়ায হিয়া লিল্লাযি ফাতারাস সামা ওয়াতি ওয়াল আরদ হানীফা ওমা আনা মিনাল মুশরিকীন” (মুসলিম ১৬৮৫)



অর্থ : নিশ্চই আমি তারই দিকে মুখ করলাম, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং বাস্তবিকই আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

আল্লাহ আমাদের এ সকল ভুল থেকে মুক্ত হয়ে নামায আদায় করার তৌফিক দান করুন।

## ৫ | নামাযের গুরুত্ব ও ফজিলত

ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নামায। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে বার বার নামাযের তাগিদ পেয়েছেন। কুরআনে পাকে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন জায়গায় সরাসরি ৮২ বার সালাত শব্দ উল্লেখ করে নামাযের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

তাই প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযকে ঈমানের পর স্থান দিয়েছেন। নামাযের গুরুত্ব ও ফায়েদা সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের সামনে অসংখ্য হাদিস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো-

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম- (হে আল্লাহর রাসুল!) আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমল কোনটি? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘নামায’। (বুখারি ও মুসলিম)

উল্লেখিত হাদিস বর্ণনা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ইসলামি স্কলার আল্লামা মোল্লা আলি ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘এ হাদিসের মাধ্যমেই আলেমগণ ঈমানের পর নামাযকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করেন।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা মনোনীত সর্বোত্তম আমল হলো নামায। অতএব যে বেশি বেশি নামায পড়তে সক্ষম, সে যেন বেশি বেশি নামায পড়ে। (তবারানি)

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের গুরুত্ব বুঝাতে হাদিসের মাধ্যমে একটি উপমা প্রদান করেছেন।

হযরত আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সময় শীতকালে বাইরে (কোথার) তশরিফ আনলেন। তখন গাছের পাতা ঝরার মণ্ডসুম ছিল। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাছের একটি ডাল হাত দিয়ে ধরলেন। ফলে তার পাতা আরও বেশি ঝরতে লাগল।

অতঃপর তিনি বললেন, হে আবু যর! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি উপস্থিত। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন-

‘মুসলমান বান্দা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নামায আদায় করে, তখন তার থেকে পাপসমূহ ঝরে পড়ে; যেমন এ গাছের পাতা ঝরে পড়ছে। (মুসনাদে আহমদ নামাযই একমাত্র ইবাদত; যার মাধ্যমে মানুষ দুনিয়ার সব কাজ ছেড়ে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত হয়ে যায়। এ নামাযই মানুষকে দুনিয়ার সব পাপ-পংকিলতা থেকে ধুয়ে মুছে পাক-সাফ করে দেয়। দুনিয়ার সব অন্যায়-অনাচার থেকে হেফাজত করে।

নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া মুমিন মুসলমানের ঈমানের দাবি ও ফরয ইবাদত। নামাযী ব্যক্তিই হলো সফল। যার সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন প্রিয়নবি। তিনি বলেছেন- “যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি যত্নবান থাকে; কেয়ামতের দিন ওই নামায তার জন্য নূর হবে এবং হিসেবের সময় নামায তার জন্য দলিল হবে এবং নামায তার জন্য নাজাতের কারণ হবে।”

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি যত্নবান হবে না- কেয়ামতের দিন নামায তার জন্য নূর ও দলিল হবে না। তার জন্য নাজাতের কোনো সনদও থাকবে না। বরং ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে তার হাশর হবে।’

## ৬ | নামায না পড়ার শাস্তি

নামায প্রত্যেকে প্রাপ্তবয়স্ক ও প্রাপ্তবয়স্কাদের উপর ফরয করা হয়েছে। কোরআন ও হাদীস শরীফের বিভিন্ন স্থানে নামায না পড়ার কঠোর বিধানের কথা উল্লেখ আছে।

কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার সালাতের হিসাব হবে। যদি সালাত ঠিক হয় তবে তার সকল আমল সঠিক বিবেচিত হবে। আর যদি সালাত বিনষ্ট হয় তবে তার সকল আমলই বিনষ্ট বিবেচিত হবে। (তিরমিযি:২৭৮)

আমরা অনেক সময় নিজেদের ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতটিকে আদায় করি না বা ছেড়ে দেই। ইচ্ছাকৃত নামায ছেড়ে দেয়া শিরকের পর সবচেয়ে বড় গোনাহ।

রাসূল সা: ইরশাদ করেন, 'যে কেউ ইচ্ছাকৃত নামায ছেড়ে দেয় আল্লাহ পাক তার হতে তাঁর জিন্মাদায়িত্ব উঠিয়ে নেন' (বুখারি-১৮, ইবনে মাজাহ-৪০৩৪, মুসনাদে আহমদ-২৭৩৬৪)। অর্থাৎ যে নামায ছেড়ে দিলো সে যেন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছেদ করল।

যে ব্যক্তি নামাযের ব্যাপারে অলসতা করে তাকে **১৫ ধরনের শাস্তি দেওয়া হবে**। তার মধ্য থেকে পাঁচ ধরনের শাস্তি দুনিয়াতে। তিন ধরনের শাস্তি মৃত্যুর সময়। তিন ধরনের শাস্তি কবরে। তিন ধরনের শাস্তি কবর থেকে উঠানোর পর।

### → দুনিয়াতে যে পাঁচ ধরনের শাস্তি হবে:

১. তার জীবনের বরকত ছিনিয়ে নেওয়া হবে।
২. তার চেহারা থেকে নেককারদের নূর দূর করে দেওয়া হবে।
৩. তার নেক কাজের কোনো বদলা দেওয়া হবে না।
৪. তার কোনো দোয়া কবুল হবে না।
৫. নেক বান্দাদের দোয়ার মধ্যে তার কোনো হক থাকবে না।

### → মৃত্যুর সময় যে তিন ধরনের শাস্তি দেওয়া হবে:

১. জিল্লতি ও অপমানের সঙ্গে সে মৃত্যুবরণ করবে।
২. ক্ষুধার্ত অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করবে।
৩. এমন পিপাসার্ত অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করবে যে, সমুদ্র পরিমাণ পানি পান করালেও তার পিপাসা মিটবে না।

### → কবরে যে চার ধরনের শাস্তি হবে:

১. কবর তার জন্য এমন সংকীর্ণ হবে যে, এক পাশের বুকুর হাড় আরেক পাশে ঢুকে যাবে।
২. তার কবরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হবে।
৩. তার কবরে এমন একটি সাপ নিযুক্ত করে দেওয়া হবে, যার চক্ষু আগুনের আর নখগুলো হবে লোহার, তার প্রত্যেকটি নখ লম্বা হবে একদিনের দূরত্বের পথ। তার আওয়াজ হবে বজ্রের আওয়াজের মতো বিকট। সাপ ওই বেনামাজিকে বলতে থাকবে, আমাকে আমার রব তোর ওপর নিযুক্ত করেছেন যাতে ফজরের নামায নষ্ট করার কারণে সূর্যোদয় পর্যন্ত তাকে দংশন করতে থাকি। যোহরের নামায নষ্ট করার কারণে আসর পর্যন্ত দংশন করতে থাকি। আসর নামায নষ্ট করার কারণে মাগরিব পর্যন্ত আর মাগরিবের নামায নষ্ট করার কারণে এশা পর্যন্ত, আর এশার নামায নষ্ট করার কারণে ফজর পর্যন্ত তাকে দংশন করতে থাকি। এই সাপ যখনই তাকে দংশন করবে তখনই সে ৭০ হাত মাটির নিচে ঢুকে যাবে (উঠিয়ে আবার দংশন করবে) এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত এই সাপ তাকে আজাব দিতে থাকবে।

### → কবর থেকে উঠানোর পর বেনামাজিকে যে চার ধরনের আজাব দেওয়া হবে:

১. তার হিসাব খুব কঠিনভাবে নেওয়া হবে।
২. আল্লাহতায়ালার তার ওপর রাগান্বিত হয়ে থাকবেন।
৩. তাকে জাহান্নামে ঢুকানো হবে।
৪. তার চেহারায় তিনটি লাইন লেখা থাকবে- ১. হে আল্লাহর হক নষ্টকারী! ২. হে আল্লাহর গোশ্বায় পতিত ব্যক্তি! ৩. তুই দুনিয়াতে যেমন আল্লাহর হক নষ্ট করেছিস তেমনি আজ আল্লাহর রহমত থেকে তুই নিরাশ হয়ে যাবি।

একবার নবী করিম (সা.) একটি স্বপ্নের কথা শুনালেন, তিনি বলেন আমাকে দুই ব্যক্তি সঙ্গে করে এক জায়গায় নিয়ে গেল। জাহান্নামে এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, তার মাথা পাথর দ্বারা আঘাত করে চূর্ণবিচূর্ণ করা হচ্ছে। এত জোরে পাথর মারা হচ্ছে যে, সে পাথর ছুটে গিয়ে দূরে পড়ছে, পুনরায় পাথর কুড়িয়ে আনতে আনতে মাথা আগের মতোই ঠিক হয়ে যাচ্ছে। পাথর এনে আবার আঘাত করা হচ্ছে। নবী করিম (সা.) সাথী দুজনকে জিজ্ঞাসা করলেন এই লোকটি কে? তখন তারা বলল এই ব্যক্তি কোরআন শরিফ শিক্ষা করে ছেড়ে দিয়েছিল এবং নামায না পড়ে ঘুমিয়ে যেত। অন্য হাদিসে আছে নবী করিম (সা.) একদল মানুষকে এ ধরনের শাস্তিতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, আর জিবরাইল (আ.) উত্তরে বললেন এরা নামাযে অবহেলা করত। (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব)

## ৭। নামায পড়েও জাহান্নামে

মনগড়াভাবে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না। কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত পন্থায় নামায আদায় করা জরুরি। এর ব্যত্যয় ঘটলে হিতে বিপরীত হতে পারে। অর্থাৎ নামায কোনো কোনো ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। এমন **তিন শ্রেণি** সম্পর্কে এখানে বর্ণনা করা হলো—

① **যারা অলসতা করে সঠিক সময়ে নামায আদায় করে না**, তাদের নামায কবুল হবে না। তাদের জন্য পরকালে শাস্তি রয়েছে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, “অতঃপর দুর্ভোগ ওই সব মুসল্লির জন্য, যারা তাদের নামায সম্পর্কে উদাসীন”। (সূরা: মাউন, আয়াত: ৪-৫)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরবিদরা লিখেছেন, এরা হলো সেইসব লোক, ‘যারা নামায থেকে উদাসীন ও খেল-তামাশায় ব্যস্ত।’ উদাসীন লোকদের মধ্যে একদল এমন আছে, যারা রুকু-সিজদা, ওঠা-বসা যথাযথভাবে করে না। কেরাত, দোয়া ও তাসবিহ যথাযথভাবে পাঠ করে না। কোনো কিছুর অর্থ বোঝে না বা বুঝবার চেষ্টাও করে না। আজান শোনার পরেও যারা অলসতাবশে এবং নামাযে দাঁড়িয়ে অমনোযোগী থাকে।

② **যারা দায়সারাভাবে নামায পড়ে এবং নামাযের বিধি-বিধানগুলো যথাযথভাবে পালন করে না**। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, ‘রাসুল (সা.) মসজিদে প্রবেশ করেন। তখন জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায আদায় শেষে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে সালাম দিল। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বলেন, তুমি যাও, পুনরায় নামায আদায় করো। কেননা তুমি নামায আদায় করোনি। এভাবে লোকটি তিনবার নামায আদায় করল। রাসুল (সা.) তাকে তিনবারই ফিরিয়ে দিলেন। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসুল! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম করে বলছি, এর চাইতে সুন্দরভাবে আমি নামায আদায় করতে জানি না। অতএব আমাকে নামায শিখিয়ে দিন!

অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, যখন তুমি নামাযে দাঁড়াবে তখন তাকবির দেবে। তারপর কোরআন থেকে যা পাঠ করা তোমার কাছে সহজ মনে হয়, তা পাঠ করবে। তারপর ধীরস্থিরভাবে রুকু করবে। অতঃপর সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর ধীরস্থিরভাবে সিজদা করবে। অতঃপর মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে বসবে। আর প্রত্যেক নামায এভাবে আদায় করবে।’ (বুখারি, হাদিস: ৭৫৭)

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় চোর ওই ব্যক্তি যে তার নামায চুরি করে। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! সে কিভাবে নামায চুরি করে? তিনি বলেন, **সে নামাযে রুকু ও সিজদা পূর্ণ করে না।**’ (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ২২৬৯৫)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ভাষায় বড় চোর হচ্ছে যারা নামাযের মধ্যে চুরি করে। পার্থিব জীবনে মানুষ মানুষের ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা চুরি করে, এটাকে সামান্য চুরি বলা যেতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের মহামূল্যবান সম্পদ, জান্নাতে যাওয়ার পুঁজি, শ্রেষ্ঠতম ইবাদত চুরি করে সে-ই প্রকৃতপক্ষে বড় চোর।

③ **যারা লোক দেখানো নামায আদায় করে**। মহান আল্লাহ বলেন, ‘যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে।’ (সূরা মাউন, আয়াত: ৬)



মুনাফিকরা মানুষকে দেখানোর জন্য নামায পড়ে। যেমন—মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়, আর তিনিও তাদের ধোঁকায় ফেলেন। যখন ওরা নামাযে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায়—লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে। আর তারা আল্লাহকে অল্লই স্বরণ করে।’ (সূরা নিসা, আয়াত: ১৪২)

মহান আল্লাহ লোক-দেখানো ইবাদতকারীকে তার আমলসহ প্রত্যাখ্যান করেন। হাদিসে কুদসিতে এসেছে, মহান আল্লাহ বলেন, ‘আমি অংশীবাদিতা (শিরক) থেকে সব অংশীদারের তুলনায় বেশি মুখাপেক্ষীহীন। যে ব্যক্তি কোনো আমল করে এবং তাতে অন্যকে আমার সঙ্গে শরিক করে, আমি তাকে ও তার আমলকে বর্জন করি।’ (মুসলিম, হাদিস নম্বর: ২৯৮৫)

## ৮। সেজদা সাহু

সেজদা সাহু

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে সহিহ তরিকায় সঠিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করার তাওফিক দান করুন। ফরয নামায আদায়ের পাশাপাশি নফল নামায আদায় করার তাওফিক দান করুন। নামাযকে পরকালের নাজাতেও ওসিলা বানিয়ে দিন। আমিন।

extra: extra: extra extra extra extra extra

### রুকু ও সিজদায় পড়ার দোয়া

② **উচ্চারণ:** সুবহা-নাকাল্লা-হুন্মা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লা-হুন্মাগফির লী।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

**অর্থ:** হে আল্লাহ! আমাদের রব্ব! আপনার প্রশংসাসহ আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে মাফ করে দিন।

**সূত্র:** হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) রুকু ও সিজদায় এই দোয়া পাঠ করতেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৪২৯৩)

③ **উচ্চারণ:** আল্লা-হুন্মা লাকা রাকাআতু ওয়াবিকা আ-মানতু ওয়া লাকা আসলামতু। খাশাআ লাকা সামঈ, ওয়া বাসারি, ওয়া মুখথি ওয়া আজমি, ওয়া আসাবি।

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعْتُ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُحْيِي وَعَظْمِي وَ عَصَبِي

**অর্থ:** হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্যই রুকু করলাম, আপনার উপরই ঈমান এনেছি, আপনার কাছেই নিজেকে সঁপে দিয়েছি। আপনার নিকট অবনত আমার শ্রবণশক্তি, আমার দৃষ্টিশক্তি, আমার মজ্জা, আমার অস্থি ও আমার শিরা-উপশিরা।

**সূত্র:** মুসলিম, মিশকাত

২. উচ্চারণ : সুবুহুন কুদুসুন রব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রুহ।

অর্থ : ফেরেশতাদের ও জিবরাঈলের প্রতিপালক আল্লাহ পূত ও পবিত্র।

সূত্র : আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) রুকু ও সিজদায় এই দোয়া পড়তেন। (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৮৭২)

৩. উচ্চারণ : সুবহানা জিল জাবারুতি ওয়াল মালাকুতি ওয়াল কিবরিয়্যি ওয়াল আজামাতি।

অর্থ : পবিত্রতা ঘোষণা করছি সেই সত্তার, যিনি সব ক্ষমতা ও রাজ্যের মালিক এবং সব গর্ব ও সম্মানের অধিকারী।

সূত্র : আউফ বিন মালিক আশজায়ি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) রুকু ও সিজদায় এই দোয়া পড়তেন। (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৮৭৩)